بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم

জুমুআর খুতবা (১৩ মার্চ ২০০৯)
সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

সৈয়্যদনা আমিরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৩ মার্চ, ২০০৯-এর (১৩ আমান, ১৩৮৮ হিজরী শামসি) জুমু'আর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـــه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صرَاط الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ] (آمين)

১২ই রবিউল আউয়াল মহানবী (সা.)-এর জন্মদিন যা দু-তিন দিন পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। মুসলমানদের একটি শ্রেণী অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এ দিনটি উদ্‌যাপন করে থাকে। পাকিস্তানসহ পুরো উপমহাদেশে অনেকেই এই দিনটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আমাদের বিরুদ্ধবাদী এবং আপত্তিকারীদের অনেকে আমাকে লিখে আবার আহমদীদেরও জিজ্ঞেস করে যে, আহমদীরা এই দিবসটি কেন যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করে না? তাই এ প্রসঙ্গে আজ আমি কিছুটা আলোকপাত করবো।

প্রকৃতপক্ষে আহমদীরাই যে এই দিনটির মূল্যায়ন করতে জানে তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখনীর আলোকে সুস্পষ্ট হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করার পূর্বে ঈদে মিলাদুন্নবী কবে থেকে পালিত হয়ে আসছে আর এর ঐতিহাসিক পটভূমি কী– তাও আমি আপনাদের অবহিত করছি।

মুসলমানদের মধ্যেও বিভিন্ন ফিরকা আছে যারা ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপনে বিশ্বাসী নয়। ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দী– যাকে উত্তম শতাব্দী বলা হয়– তখনকার মানুষের মাঝে নবী আকরাম (সা.)-এর প্রতি যে ভালবাসা দেখা যেত তা ছিল সর্বোচ্চ মানের। তারা সবাই সুন্নত সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর সুন্নত এবং শরিয়তের অনুবর্তীতায় তাঁরা সবচেয়ে বেশি আন্তরিক ছিলেন। তা সত্ত্বেও ইতিহাস আমাদেরকে একথাই বলে যে, কোনো সাহাবী বা তাবেঈ, সাহাবীদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা সাহাবীদের দেখেছেন, তাদের যুগে ঈদে মিলাদুন্নবীর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। যিনি এর প্রবর্তন করেছেন– তার নাম হচ্ছে, আব্দুল্লাহ্ বিন মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ কাদাহ্। তার অনুসারীরা ফাতেমী বলে দাবি করে এবং তারা নিজেদের হযরত আলী (রা.)-এর আওলাদ আখ্যায়িত করে। বাতেনী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার সাথে এদের সম্পর্ক ছিল। বাতেনী তারা যারা বিশ্বাস করে যে, শরিয়তের কতক অংশ প্রকাশিত আবার

কতক অংশ অপ্রকাশিত। উদাহরণস্বরূপ এরা বলে যে, ধোঁকা দিয়ে বিরুদ্ধবাদীকে হত্যা করা বৈধ, এধরনেন অনেক বিশ্বাস তাদের রয়েছে। এরাই ইসলামের ভেতর চরম পর্যায়ের বি'দাতের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, এদের সূত্রেই তা প্রচলিত হয়েছে।

অতএব সর্বপ্রথম যারা ঈদে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান আরম্ভ করেছে তারা ছিল বাতেনী ধর্মের অনুসারী। যেভাবে তারা এর প্রচলন করেছে তা ছিল নিশ্চিতরূপে বি'দাত। ৩৬২ হিজরীতে মিশরে তাদের শাসনকাল ছিল বলে জানা যায়। এ ছাড়া তারা আরো বিভিন্ন দিনের সূত্রপাত করেছে যা পালন করা হয়। যেমন, আশুরা, ঈদে মিলাদুন্নবী, মিলাদ হযরত আলী, মিলাদ হযরত হাসান, মিলাদ হযরত হোসাইন, মিলাদ হযরত ফাতেমাতুজ্ জাহরা, রজব মাসের প্রথম রাত, মধ্যবর্তী রাত, শাবান মাসের প্রথম রাত তারপর খতম এর রাত এবং রমযানের সূত্রে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। আরো অগণিত দিবস তারা পালন করে থাকে যার ফলে ইসলামে বি'দাতের প্রচলন হয়েছে।

আমি বলেছি যে, মুসলমানদের ভেতর একটি শ্রেণী বা কতক ফির্কা এমনও আছে যারা এটি উদ্‌যাপন করেন না বরং ঈদে মিলাদুন্নবীকে বি'দাত বলে মনে করে। অপর শ্রেণী এমনভাবে সীমালঙ্ঘন করেছে যা চরম বাড়াবাড়ির শামিল। যাই হোক, আমরা দেখবো এ যুগের ইমাম যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা হাকাম ও ন্যায়বিচারক হিসেবে আবির্ভূত করেছেন, তিনি এ প্রসঙ্গে কী বলেছেন।

এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে মিলাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি (আ.) বলেন, **'মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত আলোচনা করা খুবই উত্তম কাজ; বরং হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, নবী এবং আউলিয়াদের স্মরণের ফলে রহমত বর্ষিত হয়। আর স্বয়ং খোদা তা'লাও নবীদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করাকে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু যদি এর সাথে এমন বি'দাত এর সংমিশ্রণ ঘটে যার ফলে তৌহিদ বা খোদার একত্বে কোনোভাবে বিপত্তি দেখা দেয় তাহলে তা বৈধ নয়। খোদার মর্যাদা খোদাকে এবং নবীর সম্মান নবীকে প্রদান করো। বর্তমান যুগের মৌলভীদের বেশীর ভাগ কথাই বিদাত আর তা খোদার ইচ্ছা পরিপন্থি। যদি বি'দাত না হয়, তাহলে তা (মিলাদ)শুধু হিতোপদেশ বা ওয়াজ। মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব, জন্ম এবং মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করা পুণ্যের কাজ। আমরা নিজেদের মনগড়া শরিয়ত বা গ্রন্থ প্রণয়নের অধিকার রাখি না।'** (মলফুযাত-৩য় খন্ড, পৃ:১৫৯-১৬০-নব সংস্করণ)

এরা এভাবেই বি'দাতের প্রচলন করে। যদি মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত আলোচনা করতে চাও তাহলে খুবই উত্তম। কিন্তু, কার্যত মিলাদের নামে কী করা হয়? বর্তমানে বিশেষভাবে পাকিস্তান ও ভারতে, এসব জলসায় জীবনচরিত আলোচনার পরিবর্তে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজনীতির চর্চা হয়।পরস্পরের ধর্ম বা অপর ফির্কার দোষ-ত্রুটি অথবা ছিদ্রান্বেষণের কাজ করা হয়। পাকিস্তানে যেসব জলসা করে তাতে এমন কোনো জলসা নেই যেখানে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত আলোচনা করেই এরা ক্ষান্ত হয়, বরং প্রত্যেক স্থানেই আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর চরম কদর্যপূর্ণ ও ঘৃণ্য অপবাদ আরোপ করা হয়। তাঁকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে।

সম্প্রতি মৌলভীরা রাবওয়াতে অনেক জলসা করেছে, মিছিল বের করেছে। কিন্তু সেখান থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে জানা যায়, কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি এবং আহমদীদের

বিরুদ্ধে শত্রুতা আর বিষোদগারের জন্যই এই জলসার আয়োজন করেছে। এ ধরনের জলসার কোনো মূল্য নেই। মহানবী (সা.)-এর সত্তা সেই পবিত্র সত্তা, যিনি ধরায় রহমাতুল্লিল আলামীন (সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত) হিসেবে এসেছেন। তিনি শত্রুদের জন্যও কেঁদে কেঁদে দোয়া করতেন। হযরত আয়শা থেকে বর্ণিত যে, এক রাতে আমি জাগ্রত হই। হযরত আয়শা থেকে নয় বরং অন্য আরেকজন সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর সাথে তার তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। তিনি (সা.) নামাযে অনবরত এই দোয়াই করতে থাকেন, **'হে আল্লাহ, এই জাতিকে ক্ষমা করো এবং বিবেক-বুদ্ধি দাও।'**

কিন্তু, বর্তমান যুগের মোল্লারা কী করছে? এরা মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের উপর আমল করার পরিবর্তে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে (তাদের ভাষায় কাদিয়ানী) অর্থাৎ আহমদীদের বিরুদ্ধে যত প্রকার নোংরা ভাষা প্রয়োগ করা সম্ভব তা করছে এবং আহমদীদের উপর অপবাদ আরোপ করছে। মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ ছিল এরূপ: **'এক যুদ্ধে কোনো সাহাবী শত্রুকে ধরাশায়ী করেন, সে (শত্রু) কলেমা পাঠ করা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করার কথা শুনে তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে? তিনি এতটা রাগান্বিত হন যে, সেই সাহাবী বলেন, কতো উত্তম হতো হতো যদি আমি আজকের পূর্বে মুসলমান না হতাম!** কিন্তু এদের কর্ম এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যাই হোক এ হচ্ছে তাদের কর্ম, যা তারা করবেই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ধারাবাহিকতায় কী বলেন, তা আমি তুলে ধরছি। তিনি (আ.) বলেন, **' মহানবী (সা.)-এর জীবনী পর্যন্ত আলোচনা সীমিত রাখা খুবই উত্তম কাজ কেননা এতে ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর আনুগত্যের জন্য একটি প্রেরণা ও আবেগ সৃষ্টি হয়। পবিত্র কুর'আনেও অনুরূপ বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে বলা হয়েছে** وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ **কিন্তু জীবনালেক্ষ্য বর্ণনায় যদি বিভিন্ন প্রকার বি'দাতের সংমিশ্রণ করা হয়, তাহলে তা হারাম বা অবৈধ হয়ে যায়।'**

এরপর বলেন, **'স্মরণ রেখো, ইসলামের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তৌহীদ। মিলাদ-মাহফিল এর আয়োজকদের মধ্যে বর্তমানে অনেক বি'দাতের সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। যদ্বারা একটি বৈধ এবং রহমতস্বরূপ কর্মকে নষ্ট করা হয়। মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত আলোচনা করা রহমতের কারণ। কিন্তু শরিয়ত বহির্ভূত কর্ম এবং বি'দাত আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা পরিপন্থী। নতুন কোনো শরিয়তের ভিত্তি রাখার অধিকার আমাদের নেই কিন্তু বর্তমানে তা-ই হচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছা মোতাবেক শরিয়তকে রূপ দিতে তৎপর যেন স্বয়ং শরিয়ত প্রবর্তন করছে। এ ক্ষেত্রেও সীমালংঘন বা শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়েছে। অনেকে অজ্ঞতাবশত বলে, মহানবী (সা.)-এর জীবনী নিয়ে আলোচনা করাই হারাম। নাউযুবিল্লাহ্। এটি তাদের নির্বুদ্ধিতা। মহানবী (সা.)-এর গুণগানকে হারাম আখ্যা দেয়া চরম ধৃষ্টতা। কেননা, মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার আনুগত্য খোদা তা'লার প্রিয়ভাজন হওয়ার মাধ্যম ও প্রকৃত উপায়। আর স্মৃতিচারণের মাধ্যমেই আনুগত্যের চেতনা সৃষ্টি হয় এবং এর প্রতি প্রেরণা জাগে। যে ব্যক্তি কাউকে ভালবাসে সে তার স্মৃতিচারণ করে। কিন্তু যারা মিলাদ পড়ার সময় দাঁড়িয়ে যায় আর মনে করে যে, মহানবী (সা.) স্বয়ং এসে গেছেন'।** তাদের এটি ধৃষ্টতা, মিলাদ-মাহফিল চলাকালে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। ভরা মজলিসে সবাই বসে আছে আর বক্তা বক্তৃতা দিতে দিতে বলে যে, মহনাবী (সা.) এসে গেছেন। ফলে বসা অবস্থা থেকে সবাই উঠে দাঁড়ায়। তিনি (আ.) বলেন, **'মনে করে যে,**

মহানবী (সা.) স্বয়ং এসে গেছেন। এটি তাদের দুঃসাহস। এ ধরনের যেসব সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে অনেক সময় দেখা যায়, বেশিরভাগ সেইসব মানুষ এতে অংশ নিয়েছে, যারা বেনামাযী।' এমন মানুষ বসে থাকে, যারা পাঁচ বেলা নামাযও পড়ে না। বরং অনেক এমন লোকও আছে যারা নামাযই পড়ে না, কেবল ঈদের নামায পড়ে। এরাই মাহফিলে যোগ দেয়। তিনি (আ.) বলেন, **'বেশীর ভাগ এমন মানুষ যোগদান করে যারা বেনামাযী, সুদখোর এবং মদ্যপায়ী; এ ধরনের জলসার সাথে মহানবী (সা.)-এর কী সম্পর্ক? এরা কেবল বিনোদনের জন্য সমবেত হয়। তাই এরূপ ধারণা নিরর্থক।**

যে ব্যক্তি কট্টর ওয়াহাবী এবং মহানবী (সা.)-এর মাহাত্ম্যকে হৃদয়ে স্থান দেয় না, সে এক ধর্মহীন মানুষ। আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামদের সত্তাও এক প্রকার ঐশীবারী। তাঁরা উন্নত মানের আলোকিত সত্তা। তাঁরা উন্নত গুণাবলীর সমষ্টি হয়ে থাকেন। তাঁদের মাঝে বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ থেকে থাকে। তাদেরকে নিজেদের মতো মনে করা অন্যায়।

আউলিয়া এবং নবীদের প্রতি ভালবাসার ফলে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। হাদীসে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, বেহেশত একটি উন্নত স্থান হবে আর আমি তাতে থাকবো। একজন সাহাবী যিনি তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, তিনি একথা শুনে কাঁদতে আরম্ভ করলেন আর বলেন, হুযূর আমি আপনাকে খুবই ভালবাসতাম। তিনি বলেন, তুমিও আমার সাথেই থাকবে।'

মহানবী (সা.) বলেছেন যে, আমি থাকবো– এতে এই সাহাবী মনে করেছেন, তিনি হয়তো সেখানে যেতে পারবেন না। তিনি (সা.) বলেন, তুমি আমাকে ভালবাসতে তাই তুমিও আমার সাথেই থাকবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'দ্বিতীয় শ্রেণী, যারা মুশরেকদের রীতি অবলম্বন করেছে, তাদের মাঝেও কোনো আধ্যাত্মিকতা নেই; তাদের মাঝে কবরপূজা ছাড়া আর কিছু নেই। তাই প্রকৃত কথা হলো, মহানবী (সা.)-এর স্মৃতিচারণকে যেভাবে ওয়াহাবীরা হারাম বলে, আমার দৃষ্টিতে তা নয় বরং আনুগত্যের প্রেরণার জন্য তা আবশ্যক। পৌত্তলিকতার আদলে যারা বিভিন্ন বি'দাতের জন্য এটি করেন তা হারাম।'** (আল্ হাকাম ৭ম খণ্ড, ১১ সংখ্যা-পৃ: ৫, ২৪ মার্চ, ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ)।

অনুরূপভাবে এক ব্যক্তির চিঠির উত্তর লেখাতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **'আমার দৃষ্টিতে যদি বি'দাত না হয় আর জলসা করা হয়, বক্তৃতা দেয়া হয়, মহানবী (সা.)-এর জীবনী বর্ণনা করা হয়, মহানবী (সা.)-সম্পর্কে সুললিত কণ্ঠে বিভিন্ন নযম পাঠ করা হয়, তাহলে এ ধরনের জলসা খুবই উত্তম এবং এমন জলসার আয়োজন করা উচিত।'**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কীভাবে তাঁর ভালবাসা ও অনুরাগ প্রকাশের জন্য জলসার আয়োজন করতে চান বা জীবনচরিত বর্ণনা করতে চান? তিনি বলেন, ' إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي যদি আল্লাহ্কে ভালবাসতে চাও তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করো। এটি পবিত্র কুরআনের আয়াত। তিনি (আ.) বলেন, **'মহানবী (সা.) কখনও জীবিকার খাতিরে কুরআন পড়েছেন কি?'** বর্তমান সময়ের মৌলভীরা জলসা-মাহফিল করে এবং এ ধরনের বি'দাত করে বেড়ায়। কুর'আন পাঠ করা হয় তারপর রুটি বিতরণ করা হয়। বলা হয়, এটি মিলাদের রুটি, তাই অত্যন্ত বরকতময়। তিনি (আ.) বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি আল্লাহ্কে ভালবাসতে চাও তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করো।'** মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য করার ব্যাপারে কোথাও হতে এটি প্রমাণ করা যাবে কি যে, তিনি রুটি সামনে রেখে কুরআন পাঠ করেছেন?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'যদি তিনি একবারও খাবার সামনে রেখে কুরআন পাঠ করতেন তাহলে আমরা হাজার বার পড়তাম। একথা সত্য যে, মহানবী (সা.) সুললিত কণ্ঠে কুর'আন পাঠ শুনেছেন এবং তা শুনে তিনি কেঁদেছেনও, যখন আয়াত وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (সূরা আন্ নিসা: ৪২) নাযেল হয় অর্থাৎ এবং তোমাকেও ঐসব লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো' তখন এমন হয়।** অতএব তিনি অবশ্যই কুরআন শুনতেন এবং যখন এ আয়াত আসে যে, তিনি সাক্ষী হবেন, তা শুনে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন। তাঁর বিনয়ের উন্নত মানে ও আল্লাহ্‌র ভালবাসার কারণে তিনি কেঁদেছেন, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তাঁকে এই মোকাম বা পদমর্যাদায় ভূষিত করেছেন?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'তিনি (সা.) কাঁদতে কাঁদতে বলেন, থামো, আমার আর শুনার শক্তি নেই।'** তাঁকে সাক্ষী নিযুক্ত করা হবে ভেবে তিনি হয়তো চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী কোনো হাফিয পেলে আমাদের তার কাছ থেকে কুর'আন শোনার ইচ্ছা হয়।'** এ হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ। এরপর তিনি লিখেন, **'মহানবী (সা.) প্রতিটি কাজের উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা আমাদেরও করা উচিত। সত্যিকার মু'মিনের জন্য এটি অবগত হওয়াই যথেষ্ট যে, মহানবী (সা.) এই কাজ করেছেন কি করেন নি? যদি না করে থাকেন তাহলে করার নির্দেশ দিয়েছেন কি-না। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর সম্মানিত পূর্বপুরুষ ছিলেন। কিন্তু কী কারণে তিনি তার মিলাদ পড়েন নি?'** মহানবী (সা.) তাঁর জন্মদিন পালন করেন নি।

যাহোক, সারকথা হলো, জন্মদিনে জলসা করা বা কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা নিষেধ নয়। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, এতে কোনো প্রকার বি'দাত যেন স্থান না পায়। যেন মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত আলোচনা করা হয়। আর কেবল বছরে একদিনই হতে হবে এমনও নয়। স্মৃতিচারণ যদি এমন হয়; যদি প্রেমাস্পদের জীবনচরিত বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বছরের বিভিন্ন সময় এই জলসা করা যেতে পারে এবং করা উচিত। আর এটিই আহমদীয়া জামাত করে আসছে।

তাই, কোনো একটি বিশেষ দিন উপলক্ষ্যে নয়, বরং সর্বদাই জীবনী বর্ণনা করা প্রয়োজন। কিন্তু যদি কোনো একটি বিশেষ দিনকে নির্ধারণও করে নেয়া হয় আর সেদিন জলসা করা হয়, মহানবী (সা.)-এর জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়, পুরো দেশে এবং গোটা বিশ্বেও যদি এমনটি হয়, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু কোনোভাবেই বি'দাতের সংমিশ্রণ করা উচিত নয়। এমন ধারণা করা ঠিক নয় যে, এই অনুষ্ঠান থেকে আমরা যে বরকত বা আশিস লাভ করেছি এরপর আমাদের আর কোনো পুণ্যকর্মের প্রয়োজন নেই। অনেকের চিন্তা-ভাবনা এমনই। বাড়াবাড়ি বা শিথিলতা কোনোটাই কাম্য নয়।

অতএব আজ আমি অবশিষ্ট সময়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখনীর আলোকে মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরবো। যাতে আমরাও একে স্বীয় জীবনের অংশ করে নেয়ার চেষ্টা করি। তাহলেই আমরা পবিত্র কুরআনের ঘোষণানুযায়ী মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য করে খোদার ভালবাসা লাভ করবো। তখনই আমাদের অপরাধ ক্ষমা করা হবে। তখনই আমাদের দোয়া গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করবে।

অনেকে বলেন, মহানবী (সা.)-কে উসিলা বানিয়ে দোয়া করা যাবে কি? তাঁর সুন্নতের অনুসরণ এবং তাঁর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করার উসিলা বা মাধ্যম নয় কি? আযানের পরের দোয়াতেও এটিই শিখানো হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখনীর প্রেক্ষাপটে একটি আয়াতের কিছু অংশ আমি ইতিপূর্বে পাঠ করেছি। পুরো আয়াতটি হচ্ছে, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (সূরা আল্ ইমরান: ৩২) **অর্থ: 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাসো, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর; আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা** করবেন। আমাদের যার অনুসরণ করতে হবে তাঁর আমল বা কর্ম কীরূপ ছিল যা তিনি তাঁর সাহাবীদের সম্মুখে প্রদর্শন করেছেন বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। মহানবী (সা.)-এর উপর বিশ্ববাসী এই অপবাদ আরোপ করে যে, নাউযুবিল্লাহ্, তিনি পার্থিব ভোগ বিলাসিতায় সন্ধানে মানুষের উপর আক্রমণ করেছেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলকে পদানত করে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীদের সম্পর্কে বিভিন্ন বাজে কথা-বার্তা আজকাল বলা হচ্ছে, বই-পুস্ত ক লেখা হচ্ছে। এমন কথা-বার্তা লেখা হয়ে থাকে যা পড়তেও ভদ্র মানুষের রুচিতে বাঁধে। বরং আমেরিকাতেই যে নতুন বই লেখা হয়েছে তার সমালোচনায় কোনো একজন খ্রিষ্টান লিখেছেন, এটি এমন বাজে বই যা পড়তেও রুচিতে বাঁধে।

এসব অপবাদ যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি আরোপ করা হচ্ছে তা কোন নতুন ব্যাপার নয়। সকল যুগে তাঁর পবিত্র সত্তার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। যখন তিনি দাবি করেন তখনও কাফিরদের ধারণা ছিল: সম্ভবত কোনো পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে তিনি এই দাবি করেছেন। ফলে চাচার মাধ্যমে তাঁকে সংবাদ পাঠানো হলো যে, **আপনি আমাদের ধর্ম ও আমাদের প্রতিমাসমূহ সম্পর্কে কথা বলা পরিত্যাগ করুন এবং স্বীয় ধর্মের প্রচারও থেকে ও বিরত হোন; বিনিময়ে আমরা আপনার নেতৃত্ব মানতে প্রস্তুত। আমাদের পার্থিব শান-শওকত সবই আপনার পদতলে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি। আমাদের ধন-সম্পদ ও আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারী আপনাকে দেয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। তিনি উত্তর দিয়েছেন, যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও এনে দেয় তবুও আমি আমার দায়িত্ব পালন হতে বিরত হবো না। তাদের দোষ-ত্রুটি তাদের সম্মুখে তুলে ধরে তাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করার জন্যই আমি আবির্ভূত হয়েছি। যদি এ জন্য আমাকে মৃত্যুও বরণ করতে হয় আমি সানন্দে তা বরণ করবো। এ পথে আমার জীবন উৎসর্গিত। মৃত্যুভয় আমাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। কোনো প্রকার পার্থিব প্রলোভনও এ পথে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না।**

বস্তুবাদীরা সর্বদা তাঁর এই কাজকে– যা খোদা তা'লার খাতিরে তিনি করছিলেন এবং খোদা তা'লার নির্দেশে করছিলেন– পার্থিব এবং ইহলৌকিক কাজ মনে করেছে। কাফিররা তাই তাঁকে প্রলোভন দেখিয়েছে। কিন্তু তিনি কাফিরদের সকল প্রলোভনকে প্রত্যাখান করে প্রমাণ করেছেন, আমি এই পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ধন-সম্পদের জন্য লালায়িত নই। বরং আমি তো আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। সর্বশেষ নবী যিনি সমগ্র বিশ্বে এক ও অদ্বিতীয় এবং সর্বশক্তিমান খোদার পতাকা উড্ডীন করবেন। আল্লাহ্ তা'লাও তাঁর প্রতি আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁকে দিয়ে

এই কথা ঘোষণা করিয়েছেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (সূরা আল্ আন্'আমঃ ১৬৩)। **অর্থঃ 'তুমি বল, নিশ্চয় আমার নামায এবং কুরবানী-আমার জীবন ও মরণ সবই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক।'**

অতএব এই ছিল তাঁর মোকাম বা পদমর্যাদা। আপাদমস্তক খোদার ভালবাসায় নিমজ্জিত হয়ে সবকিছু তিনি লাভ করেছিলেন। পার্থিব ধন-সম্পদের তাঁর কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি এক ও অদ্বিতীয় খোদার রাজত্ব গোটা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন আর এজন্য তিনি সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি বিশ্ববাসীকে বলেছেন, যদি তোমরা অনন্ত জীবন চাও তাহলে আমার আনুগত্য করো। সেভাবে নামায পড়ার এবং সেই মান অর্জন করার চেষ্টা করো যার দৃষ্টান্ত আমি স্থাপন করেছি। ইবাদতে নিমগ্ন হওয়াতেই জীবনের নিশ্চয়তা। আর ত্যাগরে মাধ্যমে আসল মৃত্যুর পূর্বে সেই মৃত্যু বরণ করো যার উন্নত মান আমি প্রতিষ্ঠা করেছি। এর ফলে মৃত্যুর পর এক অনন্ত জীবন আরম্ভ হবে, যা মানুষকে খোদার প্রিয়ভাজন করবে।

নামায ও কুরবানীর সেই সুউচ্চ মান তিনি অর্জন করেছিলেন যা তাঁর মাঝে জীবন ও মরণের নতুন চেতনার জন্ম দিয়েছিল। আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দিয়ে ঘোষণা করিয়েছেন, আমাকে কীসের প্রলোভন দেখাচ্ছ? আমাকে যুলুম-নির্যাতনের কোন্ ভয় দেখাচ্ছ? আমার প্রতিটি কর্মই আমার খোদার জন্য। যার সবকিছু খোদার হয়ে যায় তার জন্য পার্থিব জীবন ও মৃত্যুর কোনো মূল্যই নেই।

আমি বলেছি, এই ঘোষণা করে মহানবী (সা.) আমাদেরকেও এই শিক্ষা প্রদান করেছেন যে এটি আমার আদর্শ, তোমরাও فَاتَّبِعُونِي'র নিদের্শের উপর আমল করে এই পথে পদচারণার চেষ্টা করো।

আজ মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)] জামাতকেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভয়-ভীতি দেখানোর অপচেষ্টা চলছে। পাকিস্তানের সর্বত্রই প্রতিদিন কিছু না কিছু ঘটনা ঘটছে। ভারতেও মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় আহমদীদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। বিশেষভাবে নবাগতদের চরম ভয়-ভীতি দেখানো হচ্ছে। সর্বশেষ পরিস্থিতি হলো ইউরোপের দেশ বুলগেরিয়া থেকে সম্প্রতি রিপোর্ট এসেছে যে সেখানকার মুফতির নির্দেশে আহমদীদের জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। বুলগেরিয়া সম্প্রতি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভূক্ত হয়েছে। এ অঞ্চলে মুসলমানদের বিশাল জনবসতি রয়েছে। সেখানকার মুফতির নির্দেশে পুলিশ ৭/৮ জন আহমদীকে গ্রেফতার করেছে এবং তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা সবাই দৃঢ়ভাবে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।

তাই সকল আহমদীদের সদা স্মরণ রাখা উচিত যে, এমন কোন্ যুলুম ও অকথ্য নির্যাতন রয়েছে যা তাঁর (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের উপর করা হয়নি? আমাদের উপর তার এক দশমাংশও করা হয় না। এই মূল বিষয়কে আমরা অনুধাবন করে, নিজেদের ইবাদত ও কুরবানী যদি খাঁটিরূপে আল্লাহ্‌র জন্য করেন এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত হন যে, আমাদের জীবন এবং মরণ সবই আমাদের খোদার জন্য, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে যেখানে আমরা অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবো সেখানে প্রত্যেক আহমদী ইহজগতেও সহস্র সহস্র

মৃত আত্মাকে জীবীত করার ব্যবস্থা করবে। অতএব রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ মোতাবেক প্রত্যেক আহমদীকে সর্বপ্রথম দোয়ার উপর জোর দিয়ে পার্থিব জীবন যাপনের জন্য নিরলস চেষ্টা করতে হবে। যদি আমাদের কর্ম সঠিক হয়, আমরা আদর্শ অনুকরণ করি তাহলেই আমরা নিজ জীবন গঠনের পাশাপাশি পৃথিবীবাসীর জন্যও শিক্ষণীয় আদর্শ হবো। মহানবী (সা.) আমাদের জন্য যে আদর্শ রেখে গেছেন সে-ই আদর্শে পরিচালিত হয়ে নিজ ইবাদতের মান অর্জনে সক্ষম হবো।

তিনি (সা.) ইবাদতের কীরূপ মান প্রতিষ্ঠা করেছেন তা হযরত আয়শা (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন। হযরত আয়শা (রা.)-র সূত্রে বলে দিচ্ছি, শুরুতে আমি একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছি; তাতেও হযরত আয়শা (রা.)-র বরাতে মহানবী (সা.)-এর উপর নোংরা অপবাদ আরোপের হীন চেষ্টা করা হয়েছে। যাহোক, হযরত আয়শা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত; তাঁর সত্যিকার প্রেমিক কে ছিলেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মানুষ হিসেবে স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল। কিন্তু প্রকৃত ও আসল প্রেমিক কে ছিলেন? সে সম্পর্কে হযরত আয়শা (রা.) বলেন, **'একরাতে আমার ঘরে হুযূর (সা.)-এর পালা ছিল এবং নয় দিনের মাথায় এই পালা আসতো।'** যাহোক তিনি (রা.) বলেন, **'আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমি দেখি যে, তিনি (সা.) বিছানায় নেই। আমি বিচলিত হয়ে বাইরের আঙ্গিনায় এসে দেখি হুযূর সিজদায় পতিত; আর বলছেন, 'হে আমার পরওয়ারদেগার, আমার আত্মা ও হৃদয় তোমার দরবারে সিজদাবনত।'** এই হলো, সত্যিকার প্রেমিকের সম্মুখে ভালবাসার বহি:প্রকাশ। এটি ঐসব লোকদের আপত্তির খন্ডন যারা তাঁর পবিত্র সত্তার প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করে। তিনি ঘুমন্ত অবস্থায়ও তাঁর প্রিয় খোদাকে স্মরণ করতেন; তিনি বলেন, **'আমার দু'চোখ ঘুমায় ঠিকই কিন্তু হৃদয় জাগ্রত থাকে।'** আর এই জাগ্রত হৃদয় সর্বদা খোদার স্মরণে ব্যাপৃত থাকতো। প্রতিটি চরম বিপদের মুহূর্তেও তিনি খোদাকে স্মরণ করতেন।

তিনি (সা.) বিভিন্ন পরিস্থিতি ও সময়ের জন্য যে দোয়া তাঁর জীবনাদর্শ দ্বারা আমাদেরকে শিখিয়েছেন তাও এর প্রমাণ বহন করে যে, তাঁর ওঠা-বসা সবই খোদা তা'লার যিক্‌র ও ইবাদত ছিল। অতএব, তিনি আমাদেরকে এ শিক্ষাই প্রদান করেছেন যে মু'মিনের প্রতিটি কাজ-কর্ম, চলাফেরা সবই ইবাদতে পরিণত হতে পারে যদি তা খোদাকে স্মরণ করায় এবং খোদা তা'লার খাতিরে করা হয়, যদি এই বিশ্বাস থাকে যে এই কর্ম আমাকে খোদার নৈকট্য প্রদান করবে। উদাহরণস্বরূপ, একদা তিনি তাঁর একজন সাহাবীর নব নির্মিত গৃহে যান এবং একটি জানালা দেখতে পান। এটি জানা কথা আর তিনিও জানতেন যে, কী কারণে ঘরে জানালা রাখা হয়। তিনি (সা.) তরবিয়ত করার মানসে সেই সাহাবীকে জিজ্ঞেস করেন, জানালা কেন রেখেছ? তিনি বলেন আলো-বাতাসের জন্য। তিনি (সা.) বলেন, **'একেবারে ঠিক কিন্তু যদি এই নিয়্যতে রাখতে যে এই জানালা পথে আযানের ধ্বনি ভেসে আসবে আর তা শুনে আমি নামাযে যেতে পারবো; তাহলে তুমি যে দু'টি উদ্দেশ্যের কথা বললে, তাতো পূর্ণ হতোই, পাশাপাশি এর সওয়াবও তুমি পেতে।'** তারপর আরেকটি রেওয়ায়েতে তিনি (সা.) বলেন, **'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় যদি কোনো স্বামী– স্ত্রী'র মুখে খাবারের লোকমা তুলে দেয়, তাহলে সে এর সওয়াব পাবে।'** এর অর্থ কেবল বাহ্যিকভাবে মুখে খাবারের লোকমা তুলে দেয়াই নয়, বরং সঠিকভাবে স্ত্রী সন্তানের লালন-পালন করা। তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করা।

পরিবারের দায়িত্ব পালন করা একজন পুরুষের জন্য আবশ্যক। কিন্তু সে যদি এই মানসে দায়িত্ব পালন করে যে, খোদা তা'লা আমার উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, খোদার খাতিরে আমার স্ত্রী, যে পিতা-মাতার গৃহ ছেড়ে আমার ঘরে এসেছে, তার প্রাপ্য অধিকার তাকে প্রদান করতে হবে, সন্তানের প্রাপ্য প্রদান করতে হবে; তাহলে এই দায়িত্ব পালনও সওয়াবের কারণ হয়, এটিও ইবাদত। যদি প্রত্যেক আহমদীর চিন্তা-চেতনা এমন হয় তাহলে বর্তমানে যেসব দাম্পত্য কলহ হচ্ছে, ছোট-খাট বিষয় নিয়ে তুই-তোকারি আরম্ভ হয়, এথেকেও মানুষ রক্ষা পাবে। স্ত্রী যদি তার করণীয় অনুধাবন করে যে পতি সেবার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে তাই যথার্থভাবে তা পালন করবো, আর আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে আমি এমনটি করি, তাহলে সওয়াব হবে। মহানবী (সা.) উভয় পক্ষকে বলেছেন, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে এরূপ করো, তাহলে তোমাদের এই কর্ম ইবাদতে পরিণত হবে, তোমরা এর সওয়াব পাবে। একথাগুলো মানুষের ভাবা উচিত। এমন ছোট-খাট কর্মই মানুষের এই পার্থিব ঘরকে জান্নাত সদৃশ করে তুলে।

মহানবী (সা.)-এর ইবাদত সম্পর্কে হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে, 'একরাতে আমি দেখলাম, তিনি (সা.) তাহাজ্জুদ নামাযের সেজদায় এই দোয়া করছিলেন, **'হে আমার আল্লাহ্, আমার শরীর ও আত্মা তোমার দরবারে সেজদায় রত। আমার হৃদয় তোমার প্রতি ঈমান আনে। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক, আমার দু'হাত তোমার দরবারে প্রসারিত এবং আমি এ দ্বারা নিজ প্রাণের উপর যে যুলুম করেছি তাও তুমি অবহিত। হে মহান, যাঁর কাছ থেকে সকল প্রকার মহান বিষয় কামনা করা হয়, আমার পাপসমূহ ক্ষমা করো।'** হযরত আয়শা (রা.) বলেন, **'নামায এবং দোয়া শেষ করে তিনি (সা.) আমাকে বলেন, 'জিব্রাঈল (আ.) আমাকে এই বাক্যাবলী পাঠ করতে বলেছেন, তাই তুমিও পাঠ করো।'**

এখন দেখুন, যে পরিপূর্ণ বান্দাকে দিয়ে দীর্ঘকাল পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা এই ঘোষণা করিয়েছিলেন, **'বিশ্ববাসীকে বলে দাও, আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ সবই খোদা তা'লার জন্য।'** আমি আমার জন্য কোনো কাজ করি না বা আমার ইচ্ছায় করি না অথবা ব্যক্তিগত কোনো আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য করি না; বরং আমার প্রতিটি কাজ ও কর্ম খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ্ তা'লার সেই কামেল ও পরিপূর্ণ বান্দা কীভাবে চরম বিনয় প্রকাশ করছেন? একান্ত মিনতি ও ভীতি সহকারে এই প্রার্থনা করছেন যে, আমি আমার প্রাণের উপর যুলুম করেছি তাই তুমি আমার পাপসমূহ ক্ষমা করো? আসলে এর মাধ্যমে আমাদের জন্য আদর্শ স্থাপন করা হয়েছে যে কোনো প্রকার পুণ্য করে গৌরবান্বিত হয়ো না, তোমাদের মাঝে আত্ম-অহমিকা সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার অধম বান্দা হয়ে তাঁর প্রতি সমর্পিত থাকো এবং তাঁর দয়া অন্বেষণ করতে থাকো।

তাঁর জীবনের আরেকটি দিক এখন আমি তুলে ধরছি, যা সুবিচার ও সাম্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। তিনি (সা.) বলেন, **'তোমাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির ধ্বংস হওয়ার কারণ হলো, যখন তাদের মধ্য হতে সম্ভ্রান্ত কেউ অপরাধ করতো তাকে ছেড়ে দেয়া হতো আর দুর্বল কেউ কোনো অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেয়া হতো; আমার উম্মতের ভেতর এমনটি হওয়া উচিত নয়।'** কিন্তু বর্তমান সময়ের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে ব্যাপকভাবে এটিই

ঘটতে দেখা যায়। মুসলমানদের মধ্যে আজ অবিচারের প্রচলন দেখা যায়। একটি গোত্রের সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন নারী অর্থাৎ সেই মহিলার সামাজিক অবস্থান ভালো ছিল, ফাতেমা নামের সেই মহিলা চুরি করলে মহানবী (সা.) চুরির অপরাধে তাকে শাস্তি প্রদান করেন। সাহাবীরা (রা.) তাকে শাস্তি থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত যখন কারো সাহস হয়নি তখন তাঁরা সুপারিশ করার জন্য হযরত উসামা (রা.)-কে পাঠান। তার সুপারিশ শুনে মহানবী (সা.)-এর চেহারা রাগে রক্তিম হয়ে যায়। তিনি বলেন, **'তুমি এই নারীর পক্ষে সুপারিশ করছো? কিন্তু আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি এই অপরাধ করতো তাহলে তাকেও আমি এই শাস্তিই দিতাম।'** সুবিচারের এমন মানই তিনি (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হযরত আবু যার গিফ্‌ফারী (রা.) বর্ণনা করেন, **'একদা আমি দু'জন যুবককে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হই এবং সুপারিশ করি যে, এদের মতে এবং আমিও মনে করি যাকাত আদায়ের জন্য এদেরকে নিয়োগ করা যেতে পারে। মহানবী (সা.) বলেন, আবু যার, যে (ব্যক্তি) পদের আকাঙ্ক্ষা করে আমরা তাকে পদ দেই না। যখন খোদা দায়িত্ব দেন তখন কাজ করার তৌফিক দেন।'** অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে সাহায্যও করেন। যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো কাজে নিয়োজিত করা হয় অথচ সে তার আকাঙ্ক্ষা করে না তখন আল্লাহ্ তা'লা সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে সাহায্য করেন এবং এতে বরকত সৃষ্টি করেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, **'যখন চেয়ে নেয়া হয় তখন কাজ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যেহেতু তুমি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছ, তুমি নিজেকে এর যোগ্য মনে করেছ, সামনে আসার তোমার বড় সাধ ছিল। তাই, এখন এসব দায়িত্ব পালন করে দেখাও। আমি দেখবো তুমি কতোটা পালন করতে পারো।'**

অতএব পদের লোভ করার মধ্যে প্রবৃত্তির তাড়না অন্তর্ভূক্ত থাকে। মানুষ অতি বেশী বাসনা প্রকাশ করুক এটি আল্লাহ্ তা'লার পছন্দ নয়। আজও বিভিন্ন স্থানে যেসব জামাতে তরবিয়তের ঘাটতি রয়েছে, অথবা যাদের তরবিয়তের ঘাটতি আছে তারা পদের আকাঙ্ক্ষা করে। জামাতের নির্বাচনের সময় অনেক সময় জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু তারা স্বয়ং নিজেদের ভোট দিয়ে বসে। যাহোক, এখন জামাতের সদস্যদের আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের বিধি-বিধান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছে। কেবল নবাগত কিছু লোক ছাড়া। মহানবী (সা.) বলেছেন পদের আকাঙ্ক্ষা করো না। আমাদের জামাতও এ জন্যই স্বয়ং নিজেকে ভোট দিতে নিষেধ করে। স্বয়ং নিজেকে ভোট দেবার অর্থ হচ্ছে, আমি এই পদের যোগ্য। আর আমার চেয়ে যোগ্য যেহেতু আর কেউ নেই, তাই আমাকে বানানো হোক।

অনুরূপভাবে যখন নির্বাচন হয় তখন অনেকে জামাতের নিয়মের কারণে বাধ্য হয়ে স্বয়ং নিজেকে ভোট না দিলেও অন্য কাউকেও ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকে। কাউকে ভোট না দেয়ার অর্থ দাঁড়ায় , আমি এই পদের যোগ্য কিন্তু নিয়মের কারণে যেহেতু নিজেকে ভোট দিতে পারছি না আর অন্য কেউ যেহেতু আমার চেয়ে যোগ্য নেই, তাই আমি কাউকেও ভোট দিচ্ছি না। এমন কাজ থেকেও বিরত থাকা উচিত। তরবিয়তের দিক থেকে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যদি কারো মাঝে কোনো বিষয়ে পারদর্শিতা থাকে তাহলে সে তার যোগ্যতার প্রকাশ তার পেশাদারিত্ব বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে অথবা যে ধরনের পারদর্শিতাই থাকুক না কেন তা জামাতের কোনো কর্মকর্তা বা অন্য কাউকে

সাহায্যের মাধ্যমে করতে পারে। পদ ছাড়াও সেবা করা যেতে পারে। যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সেবা করতে চান তাহলে পদের আকাঙ্ক্ষার তো প্রশ্নই ওঠে না। অতএব প্রত্যেক আহমদী, সে নবাগত, যুবক, যে-ই হোক না কেন, তার একথা স্মরণ রাখা উচিত। আমি কতক পুরনো আহমদীকেও দেখেছি তারা আপন খেয়ালে নিজেদেরকে অনেক বেশি অভিজ্ঞ মনে করে আর সীমালঙ্ঘন করে বসে। এ ধরনের কর্মকর্তাদেরও সতর্ক থাকা উচিত।

কর্মকর্তাদের বিশেষভাবে নিঃস্বার্থ হওয়া উচিত। কেবল নামে নয়, সত্যিকারেই নিঃস্বার্থ হওয়া প্রয়োজন। কর্মকর্তাদেরকে সর্বদা মহানবী (সা.)-এর এই কথা দৃষ্টিপটে রাখা কর্তব্য, **'নেতা হচ্ছে জাতির সেবক'**।

একবার হযরত আবু যার (রা.)-কে সম্বোধন করে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, **'পদ হচ্ছে একটি আমানত অথচ মানুষ বড়ই দুর্বল**।' এটি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রদত্ত আমানত অথচ মানুষ দুর্বল। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যদি আমানত রক্ষা না করো তবে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, এই আমানত রক্ষা করার জন্য একান্ত বিনীতভাবে পুরো সচেতনতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা উচিত। প্রথমত বলেছেন, নেতা জাতির সেবক হয়ে থাকেন। খিদমত করতে থাকুন তারপর সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন: হে আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে, প্রতিটি পদক্ষেপে ও মুহূর্তে আমায় সঠিক পথে পরিচালিত করো। তাহলেই একজন কর্মকর্তা তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে সক্ষম হবেন। যুবকদেরকে সাধারণত আমি সংশোধন করি ,অনেক সময় মানুষ আমার কাছে আসেন, যখন জামাতের কোনো কাজ করছেন কি-না জিজ্ঞেস করি, বলেন, বর্তমানে আমি জামাতের এই পদে আছি। অধিকাংশ সময় আমি তাদেরকে স্মরণ করাই, এটি তোমার কাছে কোনো পদ নয় বরং একটি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। সেবার প্রেরণা জাগরুক থাকলেই সঠিকভাবে খিদমত করতে পারবে।

যেসব দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করলাম–তা তিনি (সা.) আমাদেরকে খিদমত, সুবিচার, সাম্য ও সরলতা সম্পর্কে যেসব নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা সেসব তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখতে পাই। কোথাও সফরে গেলে, বাহনের অভাবে, অনেক সময় তাঁর নিজের ও গোলামের, (গোলামতো ছিল না, কিন্তু সাহাবীদের মধ্য হতে অনেকে অল্প বয়স্ক ছিলেন)জন্য অর্থাৎ প্রতি দুজনের জন্য একটি বাহন বরাদ্দ হতো ।তখন তাঁর ভাগে যে সঙ্গী পড়তো, তিনি যতটুকু সময় সেই বাহন নিজে ব্যবহার করতেন ততোটুকু সময় নিজে পায়ে হাটতেন এবং তাঁর সঙ্গীকে বাহন দিতেন। ন্যায়বিচার ও সাম্যের এমনই দৃষ্টান্ত তিনি (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। এরপর দেখুন আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশ: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (সূরা আল্ মায়েদা: ৯)। **অর্থ: 'এবং কোনো জাতির শত্রুতা যেন তোমাকে ন্যায় বিচার থেকে বিরত না রাখে। তোমরা সুবিচার করো কেননা এটি ত্বাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী**।' এটি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ। তিনি (সা.) এ প্রসঙ্গে কতো মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার একটি উদাহরণ আমি দিচ্ছি: **'যখন ইহুদীদের বিখ্যাত খায়বার দুর্গ মুসলমানরা জয়ের পর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মাঝে খায়বারের জমি বণ্টন করা হয়। এলাকাটি অত্যন্ত উর্বর এবং সুজলা-সুফলা ছিল। সেখানে অনেক**

খেজুরের বাগান ছিল। পাকা খেজুর বণ্টন করার সময় এলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সোহেল (রা.) আপন চাচাত ভাই মাহিসাকে নিয়ে খেজুর বণ্টন করার উদ্দেশ্যে সেখানে যান। অল্প সময়ের জন্য যখন তারা দুজন পৃথক হন সেই সুযোগে হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে একা পেয়ে কেউ হত্যা করে এবং তাঁর মরদেহ খাদের ভেতর ফেলে দেয়।

যেহেতু ইহুদীদের কাছ থেকে জমি দখল করা হয়েছে, তাই এর জের ধরে তাদের মধ্য হতেই কেউ হত্যা করে থাকতে পারে, সুস্পষ্ট কারণ এবং আলামত ছিল, অন্য কারো সাথে কোন শত্রুতা ছিল না আর কোন মুসলমানের হত্যা করারতো প্রশ্নই ওঠে না। যাহোক, বিষয়টি যখন মহানবী (সা.)-এর খিদমতে উপস্থাপন করা হয়, যেভাবে আমি বলেছি, ইহুদীদের দায়ী করার মতো যথেষ্ট অবকাশ ছিল। মহানবী (সা.) মাহিসাকে জিজ্ঞেস করেন, তাকে ইহুদীরা হত্যা করেছে সেকথা কি তুমি কসম খেয়ে বলতে পারবে? তিনি বলেন, আমি স্বচক্ষে দেখিনি আর যেহেতু আমি স্বচক্ষে দেখিনি তাই কসম খেতে পারি না। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, ইহুদীদের কাছ থেকে তারা হত্যার ব্যপারে হলফ নেয়া হবে। যথারীতি তাদেরকে হত্যার দায় মুক্তির ঘোষণা দিতে হবে। হত্যার দায়িত্ব তো কেউ নিবে না। কিন্তু তারা করেনি বলে জানায়। মাহিসা মহানবী (সা.)-এর খিদমতে নিবেদন করেন, ইহুদীদের বিশ্বাস কি? শতবার মিথ্যা কসম খেতেও এদের বাঁধবে না। কিন্তু যেহেতু সুবিচারের দাবি ছিল, তাই তিনি (সা.) বলেন, যদি ইহুদীরা কসম খেয়ে বলে তাহলে রেহাই পাবে। তিনি ইহুদীদের জিজ্ঞেস করেন আর তারা কসম খায়। তারপর মহানবী (সা.) বাইতুল মাল থেকে হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-র রক্তপণ আদায় করেন।'

এরূপ ন্যায়বিচার ও আদর্শ-ই তিনি (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। জীবনের কোনো দিকই তিনি উপেক্ষা করেন নি। যে দিকেই তাকাই না কেন তাঁর উত্তম আদর্শ আমরা দেখতে পাই। সুবিচারের যে উদাহরণ আমি দিলাম, বর্তমান সময় দেখুন, বড় বড় জোব্বাধারী, যারা বড় বড় মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করে, কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, আহমদীদের গালি-গালাজ করা ছাড়া সেখানে আর কিছুই হয় না। খতমে নবুয়তের নামে বড় বড় বুলি আওড়ানো হয় আর সমাপ্তি ঘটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যাচারের মাধ্যমে।

এরপর দেখুন, সাহাবীদের তরবিয়ত কীরূপ ছিল? পরিস্থিতি ও অবস্থা অনকূল ছিল, সাক্ষীও ছিল, কিন্তু তারপরও যেহেতু স্বচক্ষে দেখেন নি, তাই মিথ্যা কসম খাননি। কিন্তু বর্তমান সময়ের আলখেল্লাধারীরা ইসলামের নামধারী নেতা হবার দাবিদার। এরা ইসলামের নেতা নয় বরং নেতা হবার দাবি করে মাত্র। এরা থানায় গিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে আহমদীদের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করায়। চরম নোংরা ও ঘৃণ্য অপবাদ আহমদীদের উপর আরোপ করে, এফআইআর লিপিবদ্ধ করা হয় আর এই মোল্লারা তার সাক্ষী হয়। এদের মধ্যে খোদার কোনো ভয় নেই। যদি এরা রসূলের আদর্শে পরিচালিত হতো তাহলে অবশ্যই এদের মাঝে খোদার ভয় থাকতো। মাহিসা ইহুদীদের ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার উল্লেখ করে বলেছিল, ওদের কি? শতবার মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেও ওদের কিছু আসে যায় না। আজ দেখুন, একথা কাদের বেলায় সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়? আল্লাহ্ তা'লা সেসব নিষ্পাপ মুসলমানদের প্রতিও দয়া করুন যারা এইসব নামধারী উলামাদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। আর তাদের প্ররোচনায় অন্যায় কর্মে সম্পৃক্ত হয়। তারা বুঝতে পারছেনা যে, এ কারণেই অনেকের ঘর উজাড় হচ্ছে। মুসলমানের হাতে যেন কোনো মুসলমান নিহত না হয়, এরূপ করতে আল্লাহ্ তা'লা

কঠোরভাবে বারণ করেছেন। এর ফলে ইহকালেও শাস্তি পাবে আর পরকালের আযাব তো আছেই।

বর্তমানে পরস্পরকে হত্যা করা পশু হত্যার চেয়েও সহজ বা সাধারণ বিষয়। মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জের সময় সর্বশেষ যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন, **'তোমাদের জন্য তোমাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ রক্ষা করা সেভাবেই ওয়াজিব বা আবশ্যক যেভাবে তোমরা এই দিন এবং এ মাসের সম্মান করে থাকো।'** মহানবী (সা.) পরস্পরের প্রতি পরস্পরের রক্ত এবং ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ও সম্মানের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু আজ কী হচ্ছে? পাকিস্তানের দিকে তাকান, সেখানে একে অপরের সম্পদ লুট করছে। খোদার নামে আহমদীদের সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে। অথচ প্রত্যেক কলেমা পাঠকারী সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, সে মুসলমান।

আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের অবস্থার প্রতি রহম করুন এবং তাদেরকে এই রহমাতুল্লিল আলামীনের সত্যিকার আদর্শের উপর পরিচালিত হবার তৌফিক দিন, যাতে তারা আল্লাহ্ তা'লার দয়ার উত্তরাধিকারী হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও তাঁর (সা.)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বীয় জীবনকে সে মোতাবেক গড়ে তোলার তৌফিক দিন, আমীন।

(প্রাপ্ত সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন)